পাখির খাতা

কেমনজা কেমনজা

বাচ্চা পাখিরা দুষ্টুমি করলে, কথা না-শুনলে যখন-তখন এটা চাই ওটা চাই বলে কিচিরমিচির জুড়লে, মা-পাখিরা কী বলে তাদের ভয় দেখায় জানো? 'উর্জাজ যায়, উর্জাজ আয়, মোর ছা নে, মোর ছা নে।' তার মানে, উড়োজাহাজকে ডেকে বলে, আমার ছানাটাকে নিয়ে যা তো রে!

পাখিরা কিনা উড়োজাহাজকে ভয় পায়। অতো বড়ো ডানাওলা জিনিষটাকে আকাশে উড়তে দেখলে ভয় পাবারই কথা। তারা তো আর বোকা নয় যে উড়োজাহাজকেও পাখি বলে ভাববে। আগে বড়ো পাখিরাও খুব ভয় পেতো, অনেক দিন দেখে-দেখে তাদের সয়ে গেছে। বাচ্চা পাখিরা কিন্তু উড়োজাহাজকে এখনো খুব ভয় পায়। 'উর্জাজ যায়, উর্জাজ আয়' শুনেই তারা বায়না থামিয়ে চোখ বুজে ছোট্ট মাথাটা গায়ের পালকের মধ্যে যতোটা পারে গুঁজে দেয়।

আমাদের লেবুগাছে একসঙ্গে অনেকগুলো পাখি কাছাকাছি বাসা বেঁধে বাস করে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে আমি সারাদিন গাছতলায় বসে বাচ্চাদের নানান বায়নাক্কা শুনি। একদিন শুনলাম একটা বাচ্চা পাখি চিঁ চিঁ করে তার মাকে বলছে, 'কেঁচো না, কেঁচো না, চা-পোকা, চা-পোকা।' কেঁচো খাবে না, খাবে চা গাছের পোকা। তার মা তাকে কত করে বোঝাচ্ছে, 'কেঁচো খা, খা খোকা। কাল খাস চা-পোকা। কই হাঁ, দেখি হাঁ।' হাঁ করতে বললে কী হবে, বাচ্চা কিছুতেই ঠোঁট খোলে না।

আরেক দিন শুনি একটা বাচ্চা জেদ ধরেছে, এখনই তাকে কুঁচ ফল এনে দিতে হবে। 'কুঁচ কই, কুঁচ নাল, কুঁচ কই, কুঁচ নাল' বলে বাড়ি মাথায় করবার জোগাড়। নাল কাকে বলে জানো? লালকে।

পাখিরা ডায়মন্ডহারবারকে বলে টানমন্বার। একদিন, সেদিন খুব জ্যোৎস্না, অতো জ্যোৎস্নায় কি কারো ঘরে থাকতে ভালো লাগে! আমি বাইরে এসে দেখি লেবুগাছটা চিকচিক করছে, জ্যোৎস্নায় একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। চুপি-চুপি গাছটার খুব কাছে এসে দেখলাম, কোনো সাড়াশব্দ নেই। পাখিরা তো সন্ধ্যে হতেই ঘুমিয়ে পড়ে। আমি লেবুগাছের সামনে দাঁড়িয়ে আলো-চিকচিক চারদিক দেখতে থাকি।

একটু পরেই শুনি, বাচ্চা একটা পাখি বলছে, 'টানমন্বার যাই, কেমনজা কেমনজা, টানমন্বার যাই।' কেমনজা মানে কী মজা। এতো রাত্তিরে অতোটুকু বাচ্চা ডায়মন্ডহারবার যাবার তোড়জোড় করছে, সখ তো কম নয়। বার-বার 'কেমনজা, কেমনজা' শুনে কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় তার মা ভারি বিরক্ত হয়ে ধমকে দিল, 'চুপ যা, ঘুম যা!' বাচ্চা পাখিটা ধমক কানেই তুলল না, সে খালি বলে, 'কেমনজা, কেমনজা।' তার মা এবার আরো রেগে বলল, 'পাজি ছা, আজই যা।' বাচ্চাটা কিন্তু

সত্যি-সত্যি যাবার নামই করে না, শুধু 'কেমনজা, কেমনজা' করতে থাকে। মা-পাখিটা এবার ভীষণ রেগে তার মাথায় ঠোঁট দিয়ে একটা ঠোক্কর দিল। বাচ্চাটা ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে বসে কিচিরমিচির কান্না জুড়ল। এতোক্ষণ সে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল, স্বপ্নে ডায়মন্ডহারবার যাবার মজাটা মাঠে মারা গেল দেখে কিছুতেই তার আর কান্না থামে না। তারপর তার মা যেই বলেছে 'উজার্জ যায়, উজার্জ আয়' অমনি সে কান্নাটান্না ভুলে পালকের মধ্যে মুখ লুকলো।

সেই থেকে আমি প্রায় রোজই সন্ধ্যেবেলা লেবুতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকি যদি পাখিদের স্বপ্নের কথা শোনা যায়।

পাখির রামায়ণ

বর্ধমানের বার্নপুরে নেহরু পার্ক বলে একটা পার্ক আছে। আসল নাম লামার পার্ক। লামার নামে এক জার্মান সাহেব ওটা বানিয়েছিলেন। দামোদরের পাড়ে গোটা একটা গ্রামের মতন অনেকখানি জায়গা জুড়ে কী বিরাট আর কী সুন্দর ওই পার্ক। কতোরকম গাছ-গাছালি। পাথর দিয়ে বানানো ছোট-ছোট পাহাড়। কোথাও হ্রদ। কোথাও ফুলের মেলা। ঘুরতে ঘুরতে একবার মনে হয় কাশ্মীরে এলাম, একটু এগিয়েই মনে হয়— আরে, এ তো রাজস্থান! পার্কের এক-এক দিকে এক-একরকম।

দু-চোখ ভরে দেখে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ শুনি, বুড়ো মতন একটা পাখি কান্না-কান্না গলায় বলে চলেছে, 'হা রাম, হা লক্ষ্মণ! হা রাম, হা লক্ষ্মণ!'

মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখি, একই ডালে অনেকগুলো পাখি ভিড় করে বসে আছে। এগুলো কী পাখি? আগে কখনো দেখি নি তো। একটা পাখি বলল— 'কোথা যাস বাপ? বনবাসে বাপ? বনবাসে সাপ। বনবাসে তাপ।'

শুনে ছোট-ছোট দুটো পাখি ডাল ছেড়ে অল্প একটু উড়ে গিয়ে বলল, 'পঞ্চকূট ওই, পঞ্চকূট ওই।'

আরেকটা পাখি, সে-ও ছোট্ট, বলে উঠল, 'তিনজনে যাই, ভিন বনে যাই।'

আমি এতোক্ষণে সব বুঝতে পারলাম। এ তো রামায়ণের গল্প! ওই বুড়ো পাখিটা দশরথ, আর ছোট তিনজন নিশ্চয়ই রাম লক্ষ্মণ সীতা! কিন্তু পাখিরা এসব জানল কী করে? পাখি কখনো বই পড়তে পারে? তবে কি রামায়ণের রাম লক্ষ্মণ সীতা দশরথ সবাই এ-জন্মে পাখি হয়ে জন্মেছে?

ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, যে পাখিটা 'কোথা যাস বাপ?' বলছিল, সে বলছে, 'যাবি যদি, খাবি কী? যাবি যদি, খাবি কী?'

আরেকটা পাখি তার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'ফুল নাই, ফল নাই, পঞ্চকূটে পোকা নাই।'

ডালের শেষ মাথায় কুঁজো মতন, বিচ্ছিরি চেহারার একটা পাখি বসেছিল, বলে উঠল— 'কামরাঙা করমচা। কত আছে ফড়িং-ছা। যা না বাছা, আজই যা।'

এ নিশ্চয়ই কুঁজি-বুড়ি মন্থরা! এর জন্যেই তো রামকে বনবাসে যেতে হয়েছিল। দেখলাম, মন্থরার কথা শুনে এক সঙ্গে অনেক পাখি 'না না, না না'— বলতে লাগল,

আর বুড়ো পাখিটা ঠোঁট দিয়ে নিজের বুক ঠোকরাতে-ঠোকরাতে শুধু হায়-হায় করতে লাগল।

আমি তো অবাক। রামায়ণ কি তাহলে পাখিদেরই কাহিনী। বাল্মীকি পাখিদের এইসব ঘটনা দেখেই কি রামায়ণ লিখেছিলেন?

মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দে মুখ তুলে দেখি, তিনটে পাখি দামোদরের ওপারের দিকে উড়ে যাচ্ছে। সেখানে বিরাট একটা পাহাড় ঝাপসা নীল। এত দূর থেকে মনে হয় যেন কুয়াশার মধ্যে বিরাট একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে। আমার পাশ দিয়ে একটা মালী যাচ্ছিল। আমি বললাম— 'ওটা কী পাহাড়?'

—'ও তো পঞ্চকূট!' বলে সে তার কাজে চলে গেল।

পঞ্চকূট? রামেরা তো চিত্রকূট পাহাড়ে গিয়েছিল। আর পঞ্চবটী বনে। রামায়ণ যদি আসলে পাখিদেরই গল্প, তাহলে ওই তিনটে পাখি পঞ্চকূটের দিকে উড়ে যাচ্ছে কেন? আর এই জায়গাটার নামও তো কই অযোধ্যা নয়, এ তো বর্ধমানের বার্নপুর!

পাখিদের রামায়ণ দেখে মানুষের রামায়ণ লিখতে বসে বাল্মীকি নিশ্চয়ই জায়গার নাম-টাম একটু-আধটু বদলে দিয়েছিলেন। এটা যে আসলে পাখিদেরই গল্প, পাছে কেউ বুঝতে পেরে যায়!

জন্মট্রান উজবেকিট্রান

শীতকালে কলকাতায় কত যে বিদেশী পাখি আসে, কেউ তা গুনে শেষ করতে পারে না। হাজার-হাজার পাখি দলে-দলে কত দূর-দূর দেশ থেকে প্রতি বছর ঠিক একই সময়ে উড়ে আসে। সবচেয়ে আশ্চর্য, পাখিদের কখনো পথ ভুল হয় না। এরোপ্লেন পর্যন্ত ঝড়ে পথ হারিয়ে অচেনা সাগরে, মরুভূমিতে নেমে পড়ে। আমি তো একবার সামান্য ডিমাপুর থেকে হাফলং যেতেই ভুল ট্রেনে উঠে লামডিং জংশনে নেমে পড়েছিলাম। অথচ পাখিরা দ্যাখো, সেই কোন আলাস্কা থেকে, সাইবেরিয়া থেকে পথ চিনে-চিনে হাজার-হাজার মাইল আকাশ সাঁতরিয়ে ঠিক কলকাতায় পৌঁছে যায়। ওদের না আছে কম্পাস, না আছে মানচিত্র।

চিড়িয়াখানায় ঘুরে-ঘুরে আমি এরকম প্রচুর পাখি দেখছি আর এইসব ভাবছি, এক জায়গায় শুনি, আমাদের সুন্দরবনের একটা পাখি বলছে, 'জন্মট্রান? জন্মট্রান?'

তার সামনেই খুব সুন্দর একদল বিদেশী পাখি ঠোঁট দিয়ে পালক-টালক ঠিক করছিল। মনে হয়, এরা সবে এসে পৌঁছেছে। অতোটা পথ উড়ে এসেছে তো, হাওয়ায় পালকগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে, তাই বোধহয় ঠোঁট দিয়ে ঠিক করে নিচ্ছে, সুন্দরবনের পাখিটা দেখলাম টুক-টুক করে লাফিয়ে-লাফিয়ে এই পাখির দলের কাছে এসে দাঁড়াল। বার-কতক তার ছোট্ট ঘাড় বাঁকিয়ে ওদের ল্যাজ থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে আবার বলল, 'জন্মট্রান? জন্মট্রান?'

বুঝেছো? বিদেশী পাখির দলটাকে ওদের জন্মস্থান কোথায় জিজ্ঞেস করছে।

ওদের মধ্যে একটু গম্ভীর ধরনের একটা পাখি পালক সাফ করা থামিয়ে বলল, 'উজবেকিট্রান, উজবেকিট্রান, উজবেকিট্রান।' উজবেকিস্তান বলে একটা দেশ আছে

না? ওরা আসলে সেখানকার পাখি।

সুন্দরবনের পাখিটা মনে হয় চিড়িয়াখানার পাখিদের দলপতি। ডানা নাচাতে-নাচাতে খানিক উড়ে গিয়ে আরেক দল বিদেশী পাখিকে ওইরকম করে তাদের জন্মস্থান জিজ্ঞেস করল।

আমি দেখলাম, লম্বা-গলা একটা পাখি নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করছে। সে-ই বোধহয় এদের দলপতি। পাখিদের সব দলেই দেখছি একজন করে দলপতি থাকে। তো, সেই লম্বা-গলা পাখিটা সুন্দরবনের পাখির কাছে এসে ভারি মিষ্টি করে বলল, 'ম্যানচেট্টার ম্যানচেট্টার।'

তার মানে ম্যানচেস্টার। পাখিদের ঠোঁটে মাঝের স-টা ঠিক আসে না। ফরাসিরা যেমন হসপিটালকে ওপিতাল বলে, একবার বলেছিলাম না?

উঃ, কত দেশের কত যে পাখি! চিড়িয়াখানায় একেবারে পাখির মেলা বসেছে। চোখের পলক ফেলতেও ইচ্ছে করে না।

হঠাৎ শুনি 'থাকছো ক দিন? থাকছো কত দিন?' বলতে-বলতে সাত-আটটা এদেশী পাখি কোত্থেকে উড়ে এসে আমার বুক ঘেঁষে খানিক এগিয়ে ডানা গুটিয়ে ঝুপ-ঝুপ করে নেমে পড়ল। ম্যানচেস্টারের দলটার ঠিক সামনেই। পাখিদের একটা সুবিধে, যে যে-ভাষাই বলুক না কেন, এক-দেশের পাখি আরেকদেশের পাখির ভাষা বুঝতে পারে। 'থাকছো ক দিন?' শুনে ম্যানচেস্টারের দলপতি এবারও খুব মিষ্টি করে বলল, 'হোলুইনটার, হোলুইনটার।'

তার মানে গোটা শীতকালটা।

প্রকাশ: মার্চ ১৯৯১